অস্তিত্ব সঙ্কটে সিলেটের নদ-নদী : মানবিক ও পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা

নাব্যতা সঙ্কটে জেগে উঠছে অসংখ্য চর

আবদুল মুকিত : স্থানে স্থানে ছোট-বড় অসংখ্য চর। চরের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে যাচ্ছে জলের ক্ষীণধারা। চর থেকে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নদীর তলদেশের মাটি। নদীর এপারে-ওপারে চলছে গাড়ি। নদীর বুকে গড়ে উঠেছে খেলার মাঠ। যেখানে চলছে ছেলেদের ক্রিকেট খেলা। নদী! কিন্তু কোথাও দেখে মনে হবে খাল। এই শুকিয়ে যাওয়া নদীর ধারে ধারে পড়ে আছে ছোট ছোট নৌকা। এমন করুণ দৃশ্যই এখন চোখে পড়ে সিলেটের প্রধান দুটি নদী সুরমা ও কুশিয়ারার। এক সময়ের স্রোতস্বিনী এ দুটি নদীই শুধু নয়, নাব্যতা হারানোর কারণে এ অঞ্চলের মনু, ধলাই, সোনাই, খোয়াই, সারি, পিয়াইন, করাঙ্গী, সুতাং, বেড়ামোহনা, শুটকি, বিজনা, রত্না, কালনী, সূতি, সিংগুয়াসহ সবক'টি নদ-নদী আজ বিপন্ন। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ সময়মতো ড্রেজিং না করা, অবৈধভাবে দখল করে মাটি ফেলে ফসলের জমি কিংবা স্থাপনা তৈরির মহোৎসব, উৎসমুখে বাঁধ ও অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট তৈরি ইত্যাদি কারণে পানি প্রবাহ কমে গিয়ে এবং চর পড়ে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসংখ্য নদ-নদী হারিয়ে যাচ্ছে। উৎসমুখ ভরাট হওয়ার পাশাপাশি নদীগুলোতে পলির স্তর পড়ায় বর্ষা এলেই নদীর দু'কূল ছাপিয়ে অকাল বন্যা হয়। আর তলদেশ ভরাট থাকার কারণে বর্ষায়ও নদী দিয়ে বড় বড় নৌকা চলাচল করে না। এ জনপদের অন্তত ১০টি নদীবন্দর ইতোমধ্যে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে শুকনো মৌসুমে নদীর কোথাও আর জলধারা থাকে না। এ কারণে এ সময় জমিতে সেচের জন্য সামান্য পানি পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে পানির দুষণমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় নদীর জীব-বৈচিত্র্যও হুমকির মুখে পড়েছে। এমতাবস্থায় নদীকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা এ জনপদে অদূর ভবিষ্যতে চরম মানবিক ও পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।

সুরমা ও কুশিয়ারাসহ অসংখ্য খরস্রোতা নদনদী ও শাখানদী বিধৌত এ অঞ্চলটি নৌযোগাযোগ সুবিধার জন্য যোগাযোগ, পরিবহন ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতো। আর এ কারণে এক সময় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট এবং কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নদ-নদীর তীরবর্তী জনপদগুলোতে গড়ে ওঠে নৌবন্দর, নৌচলাচল কেন্দ্র ও অসংখ্য হাট-বাজার।

এসব হাট-বাজারের অধিকাংশই প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রের মর্যাদা পায়। একই কারণে এসব নৌবন্দর ও নৌচলাচল কেন্দ্রগুলোর কাছে স্থাপন করা হয় বড় বড় পাটগুদামসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা। তখন এ অঞ্চল থেকে নৌপথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা রক্ষা সম্ভব হতো। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এ অঞ্চলের সেই প্রসিদ্ধ পাটগুদামসহ অসংখ্য শিল্পকারখানা গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। আজ এসব শুধু কেবলই স্মৃতি।

জানা গেছে, সিলেট বিভাগের সব প্রধান নদীরই উৎসস্থল হচ্ছে ভারতের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা। এসব নদ-নদীর উৎস এলাকায় বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকার পরিকল্পিতভাবে তাদের মতো করে প্রজেক্ট তৈরি করায় এসব নদীর পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে সেখানকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে। ফলে শুকনো এবং বর্ষা-দুটো মৌসুমেই নদীর স্বাভাবিক স্রোত ব্যাহত হচ্ছে।

ভারতের আসাম রাজ্য থেকে নেমে আসা বরাক নদী সিলেটের সীমান্তবর্তী জকিগঞ্জ উপজেলার অমলসীদ এলাকায় সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সুরমার উৎসমুখ ভরাট হয়ে যাওয়ায় এতদিন এ নদী দিয়ে বরাকের মাত্র ২০ ভাগ পানি প্রবাহিত হত। আর বাকি ৮০ ভাগ প্রবাহিত হত কুশিয়ারা দিয়ে। কিন্তু উৎসমুখ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গত কয়েক বছর ধরে সুরমা নদীতে বরাকের পানি প্রবাহ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আর এ কারণে সুরমা এখন বলতে গেলে জলধারাহীন।

নদী খনন না হওয়ায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে ভাঙন সমস্যা তীব্র আকারে রূপ নিয়েছে। জকিগঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ক্রমাগত ভাঙনের ফলে সীমান্তবর্তী জকিগঞ্জ উপজেলার প্রায় ৩০ কিলোমিটার এলাকা এখন ভারতের দখলে চলে গেছে।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি উৎস থেকে নেমে আসা মনু নদী মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার শরীফপুর এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পরে কুলাউড়া, রাজনগর ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ওপর দিয়ে প্রায় ৫৬ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সদর উপজেলার মনমুখ নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। স্বাধীনতার প্রায় অর্ধযুগ পরে মৌলভীবাজার জেলার ৫৬ হাজার একর কৃষি জমি ও জনবসতিকে বন্যার তাণ্ডব থেকে রক্ষা এবং শুকনো মৌসুমে সেচ সুবিধাদানের লক্ষ্যে মনু নদী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার শহরের প্রায় ২ কিলোমিটার পূর্বদিকে মাতারকাপন এলাকায় মনু নদীর ওপর শতাধিক কোটি টাকা খরচ করে স্থাপন করা হয় মনু ব্যারেজ। এদিকে জানা গেছে, ভারত সরকার ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের নালকাটা নামক স্থানে মনু নদীর ওপর একটি ব্যারেজ নির্মাণ করায় গ্রীষ্ম ও বর্ষা উভয় মৌসুমে নদীর পানিস্রোত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সেখানকার কর্তৃপক্ষের হাতে চলে গেছে। এর ফলে বাংলাদেশ অংশ নদীর তলদেশ মারাত্মকভাবে ভরাট হয়ে নদীর এই অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একটি বিদেশি সাহায্য সংস্থার উদ্যোগে কালিনী-কুশিয়ারা নদীতে নৌযান চলাচল অব্যাহত রাখা, নদী তীরে বাঁধ নির্মাণ, ভাঙন রোধ এবং বিশাল বাঁধের ওপর নতুন গ্রাম তৈরির লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের জন্য কয়েক বছর আগে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। জানা গেছে, প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হলেও পরবর্তী সময়ে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, বন্যার পানির সঙ্গে লাখ লাখ টন পাহাড়ি বালি ও পলি ভেসে আসছে। ভেসে আসা বালি ও পলি নদীতে স্রোত না থাকায় নদীসমূহের তলদেশে জমে নদী ভরাট হয়ে উঠছে। এর বিরূপ প্রভাব সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জনপদে পড়ছে। নদী তীরবর্তী জনপদে তৈরি হচ্ছে মরুময় পরিবেশের।

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, দোয়ারাবাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ সদর, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, রাজনগর এবং হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ ও বানিয়াচং প্রভৃতি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা এ হুমকির মুখে পড়েছে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রায় ২৯৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকাবেষ্টিত কোম্পানীগঞ্জবাসী ধলাই ও পিয়াইন নদীর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বালির স্তর জমে শুকনো মৌসুমে এ দুটি পাহাড়ি খরস্রোতা নদী বালুচরে হারিয়ে যায়। একটি সূত্রে জানা যায়, কোম্পানীগঞ্জ এলাকার ধলাই নদীর প্রবাহ পুনঃউদ্ধার প্রকল্প হাতে নেয়া হয় ১৯৯৪ সালে। ৫ কোটি ২ লাখ টাকার এই প্রকল্পের আংশিক কাজ করার পর প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। একইভাবে পিয়াইন নদী পুনঃখনন প্রকল্পটিও বাস্তবায়ন হয়নি।

এদিকে ১৯৪৭ সালের পর এ পর্যন্ত বরাক নদীর উৎপত্তি থেকে কুশিয়ারা নদীর ভাঙনজনিত কারণে জকিগঞ্জের এক বিরাট এলাকা ভারতের অংশে চলে গেছে। ১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ বরাক নদীর মুখ থেকে গজুকাটা পর্যন্ত ২২ মাইল এলাকায় প্রবাহিত কুশিয়ারা নদীর মধ্যে স্রোত আন্তর্জাতিক সীমারেখা চিহ্নিত করে। কিন্তু এতদিনে সেই সীমারেখার অস্তিত্বই বিলুপ্তির পথে বলে জানা গেছে।

সিলেট অঞ্চলের নদ-নদীর অস্বাভাবিকতার কারণে সিলেট অঞ্চলের শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যও এখন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুকনো মৌসুমে প্রতি বছর সিলেট অঞ্চলের নদ-নদীতে পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়ে নৌপথ ব্যাহত হওয়ায় হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার নদী তীরে অবস্থিত প্রধান হাটবাজারগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্যেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। সেচ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে। সিলেট অঞ্চলের নদ-নদীর অস্বাভাবিকতা রোধকল্পে স্বাধীনতার পর থেকে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য ছোট-বড় প্রকল্পের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। নদী ভরাটের এ ধারা যদি অব্যাহত থাকে এবং নদী খননে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর সিলেটের জলাভূমির দৃশ্যপট পাল্টে যাবে। এ অঞ্চলে এক সময় মরুভূমির পরিস্থিতি চলে আসবে।

xxxxxxxxxxxxxxxx